১৯৭০ এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ

ইউনিট ১৪

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৪.১ ঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচন
পাঠ-১৪.২ ঃ অসহযোগ আন্দোলন : মার্চ ১৯৭১
পাঠ-১৪.৩ ঃ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা
পাঠ-১৪.৪ ঃ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাঠ-১৪.৫ ঃ বেসামরিক ও সামরিক প্রতিরোধ এবং ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ
পাঠ-১৪.৬ ঃ জেনোসাইড বা গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ১৯৭১-এর শরনার্থী
পাঠ-১৪.৭ ঃ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা
পাঠ-১৪.৮ ঃ মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত
পাঠ-১৪.৯ ঃ স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বিজয় দিবস
পাঠ-১৪.১০ ঃ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সরকার গঠন

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ**

পাঠ-১৪.১ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি, নির্বাচন পদ্ধতি, আসন বণ্টন প্রভৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, এক ইউনিট, আইন কাঠামো আদেশ, নির্বাচনী মেনিফেস্টো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভূট্টো, আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, সাইক্লোন।

ভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেশটির কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন চালু ছিল। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রথম দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। স্বভাবতঃই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জাতীয় পরিষদ গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি সামরিক আইনের অধীনে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে জারি করেন। ২৮ নভেম্বরের (১৯৬৯) বেতার ভাষণে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইয়াহিয়া খান দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রথমত ঃ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা দেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) ইয়াহিয়া খান আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেমন,

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার,
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন,
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা,
৪. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা এবং
৫. পাকিস্তানে একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ঘোষণা করা হয় 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal Frame Work Order, LFO)।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

নির্বাচন

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়।

নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬২ টি সাধারণ আসনে একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন দলই সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। উক্ত ১৬২টি আসনে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল যথাঃ মুসলিমলীগ (কনভেনশন) ৯৩, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ৬৫, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ৫০, জামায়াতে ইসলামী ৬৯, জমিয়াতুল উলামা ও নেজামে ইসলামী ৪৫, পিডিপি ৮১, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ৩৬, স্বতন্ত্র ১০৯ এবং অন্যান্য ছোট দলসহ সর্বমোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৭৬৯ জন।

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে ঘোষণা করে। তারা নির্বাচনকে ছয়দফা ও এগারদফার প্রশ্নে একটি গণভোট বলে অভিহিত করেন। নির্বাচনে জয়লাভ করলে ছয়দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান প্রণয়ন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। আওয়ামী লীগ 'জয়বাংলা' স্লোগানকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই শ্লোগানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করতে পারলে আওয়ামী লীগ দেশে অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়। ঘোষণা করা হয় যে, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন এবং ব্যাংকবীমা কোম্পানিসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে জনগণের মালিকানায় আনা হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রতি ব্যাপক সমর্থন ও সেসব শিল্পের উপর নির্ভরশীল মানুষকে পেশাগত ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ। পাট, তুলা ব্যবসায় জাতীয়করণ এবং অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু, তামাকের উপর অবজ্ঞার অবসান ঘটিয়ে চাষীদের জন্য ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করা হবে ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী প্রচার অভিযান

অন্যান্য দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নীতি, পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী নীতি এবং ভারত বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৫৬ সালের সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করে উক্ত সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মত দেয়। সংশোধনীগুলি ছিল যেমন জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল ইত্যাদি। জামায়াত আওয়ামী লীগের ছয়দফার বিরোধিতা করে।

ন্যাপ (ওয়ালী) এর পূর্ব পাকিস্তান শাখা ন্যাপ (মোজাফ্ফর) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অগ্রাধিকার দিলেও ক্ষমতার বণ্টন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ছয়দফা থেকে তাদের দাবি অনেক নমনীয় ছিল।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সাইক্লোন ও নির্বাচনে তার প্রভাব

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা হয়। স্বভাবতই নির্বাচনের তারিখ পুনঃ নির্ধারিত হয়ে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় প্রায় দুই লক্ষ লোকের জীবন কেড়ে নেয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা এক ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। এই বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে প্রায় সকল দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার দৃঢ় প্রতিবাদ করে। অবশেষে নির্বাচন পূর্বঘোষিত সময় অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি ঘূর্ণি-উপদ্রুত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের ফলাফল

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির নূরুল আমিন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে)। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো মিল ছিল না।

৩. পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল রায় ছিল ৬ দফার প্রতি গণরায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেটস্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে প্রত্যাখান করে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান করে। আওয়ামী লীগ ছয়দফার দাবিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। পক্ষান্তরে পিপিপি সহ অন্যান্য ডানপন্থী দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। ভূট্টো হুমকি দেন যে, তাঁর মতামত গ্রহণ করা না হলে তাঁর দল জাতীয় সংসদে অধিবেশন বয়কট করবে। তাঁর প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধুও স্পষ্ট করে ঘোষণা দেন, প্রয়োজনে তিনি একাই সংবিধান প্রণয়ন করবেন। এমনি পরিস্থিতিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর দাবির নিকট মাথা নত করেন। তিনি ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় মার্চের অসহযোগ আন্দোলন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এক ব্যক্তি এক ভোট ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করায় এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি সাধারণ ও ৭টি মহিলা আসন লাভ করার মাধ্যমে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, যা মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের অবসানের পর কে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
ক) টিক্কা খান খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) ইয়াহিয়া খান

২। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের মূলে কী ছিল? (অনুধাবন)
ক) সরকারের সাথে সমঝোতার ভিত্তি খ) বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ছয় দফা দাবির ভিত্তি
গ) সর্বদলীয় ঐক্যের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঘ) পিপলস পার্টির সহযোগিতা নেওয়া

৩। নিচের ছকটি দেখে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

নির্বাচন	মোট আসন সংখ্যা	আওয়ামীলীগ	পিপলস পার্টি
জাতীয় পরিষদ	৩১৩	১৬৭	৮৮
প্রাদেশিক পরিষদ	৩০০	২৮৮	-

উদ্দীপকে (ছকে) কত সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে?
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৬৫
গ) ১৯৭০ ঘ) ১৯৭৩

৪। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে খ) পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়
গ) পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়

৫। বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ বাঙালিদের দুঃসময়ে এগিয়ে আসলেও পাকিস্তানের শাসকবর্গ নিষ্ক্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেয়?
ক) ১৯৬৯ সালের জলোচ্ছ্বাস খ) ১৯৭০ সালের ঘুর্ণিঝড়
গ) ১৯৭১ সালের দুর্ভিক্ষ ঘ) ১৯৭২ সালের বন্যা

পাঠ-১৪.২ অসহযোগ আন্দোলন : মার্চ ১৯৭১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বন্দি হওয়ার কথা উল্লেখ করতে পারবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন, টিক্কা খান, পল্টন ময়দান, স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা।

৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং পরদিন সারাদেশে হরতাল ডাকেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২ এবং ৩ মার্চ হরতালের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতার ঘোষণা দাবি করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সভায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। ইশতেহারে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের তিনটি লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়। যেমন:

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করা হবে,
২. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা হবে এবং
৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করা হবে।

সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেসকল কর্মপন্থা ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে,
২. আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি বাহিনী গঠন করতে হবে,
৩. হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে, ইত্যাদি।

২ মার্চ হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং অনেকে আহত হলে ঐ দিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিল : ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। ৭ মার্চ বেলা ২ টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। ৩ মার্চ ছাত্রলীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন।

এমনি পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ (১৯৭১) জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। একই দিন তিনি কঠোর প্রকৃতির সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণটি ইতিহাসে 'বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ' নামে অভিহিত হয়েছে। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধুর দুটি উদ্দেশ্য লক্ষ করা যায়, যেমন–

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১. **'এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'**

–এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

২. উক্ত ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন, যেমন:

ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে,

খ) অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে,

গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং

ঘ) (জাতীয় অধিবেশনের পূর্বেই) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এই শর্তগুলো মানলেই যে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এমন নিশ্চয়তা ভাষণে দেননি। ৭ মার্চের ভাষণে আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন।

৭ মার্চ ভিন্ন এক ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সাতদিন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দশদফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দফাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. কর না দেওয়ার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে,

২. সকল অফিস ও আদালতে ধর্মঘট চলতে থাকবে,

৩. রেল ও বন্দরসমূহ চালু থাকবে। তবে সেনাবাহিনী চলাচলের কাজে শ্রমিক-কর্মচারীরা সহযোগিতা করবে না,

৪. রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে গণআন্দোলনের সংবাদ গোপন রাখা যাবে না,

৫. কেবল স্থানীয় এবং আন্তঃজেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক ও টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে,

৬. সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে,

৭. কোন মাধ্যমেই ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠাবে না,

৮. প্রতিদিন সব ভবনের উপর কালো পতাকা ওড়ানো হবে,

৯. অন্য সব ক্ষেত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে ধর্মঘট আহ্বান করা হলে তা পালন করতে হবে,

১০. প্রতিটি মহল্লা, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা এবং জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে।

৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নাম থেকে পূর্বপাকিস্তান বাদ দিয়ে কেবল 'ছাত্রলীগ' করা হয়। জেলা থেকে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ', গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো, উর্দু সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৯ মার্চ এক প্রচারপত্রে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।

৯ মার্চ মাওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।

৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেলিনবাদী) এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, অস্ত্র হাতে লড়াই করতে আহ্বান জানায়।

১১ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রচারপত্রে শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ববাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করে তোলার আহ্বান জানায়।

১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতির মাধ্যমে এ যাবত কার্যকরী সকল নির্দেশাবলি বতিল করে দেন এবং ১৫ মার্চ থেকে কার্যকর করার জন্য ৩৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি

পূর্ব পাকিস্তানে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করেন।

সর্বশেষ সমঝোতা অভিনয়

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সমঝোতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন জেনারেলসহ ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আগত। পাঞ্জাবিরা কিছুতেই ছয় দফার বাস্তবায়নে সম্মত ছিল না। আওয়ামী লীগও ছয়দফার প্রশ্নে ছাড় দিতে রাজি ছিল না। ইতোমধ্যে ঢাকায় ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান সংকটের সামরিক সমাধান দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় কালক্ষেপণ করে অলক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনয়ন করতে থাকে। পাকিস্তান সামরিক জান্তা শক্তির সাহায্যে বাঙালির

দমন করার একটি পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এর নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ৩ ব্যাটেলিয়ান পাকিস্তানী সৈন্য 'অপারেশন সার্চলাইটে' অংশ গ্রহণ করে।

অবশেষ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা সংগঠিত করে। ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান বাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১ টা ১০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বন্দি করে এবং পরে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যায়। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর বন্দি হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ৯ এপ্রিল (১৯৭১)। বন্দি হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণের মর্মকথা পর্যালোচনাপূর্বক একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষককে দিবেন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে লাগাতারভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যা ইতিহাসে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' ঘোষণা করে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সংগে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার অভিনয় করেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার গণহত্যা চালায় এবং রাত ১.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে। বন্দি হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয় কবে? (জ্ঞানমূলক)

ক) ২৭ ফেব্রুয়ারি খ) ২৮ ফেব্রুয়ারি
গ) ১ মার্চ ঘ) ২ মার্চ

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয় (অনুধাবন)

i) ২ মার্চ ১৯৭১ ii) ৩ মার্চ ১৯৭১ iii) ৪ মার্চ ১৯৭১

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

অচিন্ত্যপুর, পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সমন্বয়ে এক দেশ। পশ্চিমাংশের লোকরা পূর্বাংশে অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করলে দেশটির পূর্বাংশের এক নেতা জনগণের প্রতি অসহযোগ আন্দোলনের সম্পৃক্ত হওয়ার ডাক দেন। ফলে কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী শিক্ষার্থী সাধারণ জনতা নির্বিশেষে সকলে অবিসংবাদিত নেতার আহবানে সাড়া দিয়েছিল।

৩। উদ্দীপকে বর্ণিত অংশে কোন নেতার ছবি ফুটে উঠেছে?

ক) এ.কে ফজলুল হক
খ) মাওলানা ভাসানী
গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি
ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

৪। এই অবিসংবাদিত নেতার আন্দোলন ছিল মূলত–

i) স্বৈরাচার শাসকের বিরুদ্ধে
ii) পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে
iii) সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৫। বঙ্গবন্ধুর কত তারিখের বক্তব্য ছিল স্বাধীনতার একটা মাইলফলক?

ক) ৭ মার্চ
খ) ১১ মার্চ
গ) ১৫ মার্চ
ঘ) ১৯ মার্চ

পাঠ-১৪.৩ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর বাণী বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বাধীনতার ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

বঙ্গবন্ধু বন্দি হওয়ার পূর্বেই চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম. এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি স্বাধীনতার দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (পৃ.১)। বাণীটি নিম্নরূপ:

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

(বাংলা অনুবাদ): 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। এই আমার শেষ কথা। যে যেখানেই থাকুন না কেন সকলের প্রতি আমার আবেদন রইল, যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করুন এবং বাংলার মাটি থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না-হওয়া পর্যন্ত লড়ে যান'।

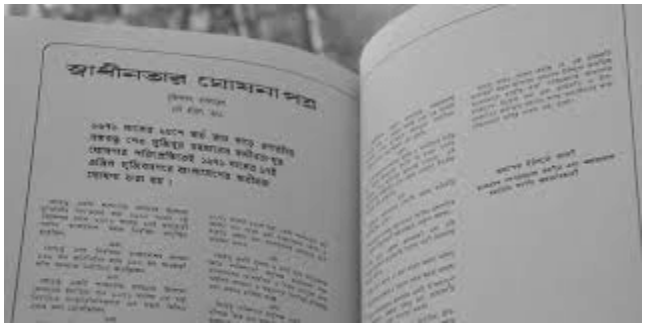

স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র

এম.এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন।

২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিও স্বাধীনতার দলিলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে পাদটীকায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল'।

সেনাবাহিনীর অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলে নয় মাস। এ যুদ্ধ আপামর জনসাধারণের কাছে মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। সে কারণে তা স্বাধীনতার যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে। এ জন্য দিবসটি আমাদের কাছে বিজয় দিবস হিসেবে পরিচিত ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি মুখস্থ করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১.২০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহর) পাকিস্তানী বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে। বন্দি হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম.এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৪ ডিসেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

২। ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরে গ্রেফতারের পূর্বে কে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?

ক) আতাউল গনি ওসমানি খ) মাওলানা ভাসানী
গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ) অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

৩। আকলিমা রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঘুরতে এসে জেনেছে ১৯৭১ সালে এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন পুলিশ বাহিনীর অসংখ্য সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত–

i) ২৫ মার্চ গভীর রাত
ii) অপারেশন ক্লিনহার্ট
iii) অপারেশন সার্চলাইট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৪ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকার গঠনের পটভূমি ও সরকারের সদস্যদের নাম বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুজিবনগর সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, উপদেষ্টা কমিটি।

ভূমিকা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামেই বেশি পরিচিত। অনেকে একে প্রবাসী সরকার বলেন। তবে এ সরকারকে বাংলাদেশ সরকার বা মুজিবনগর সরকার বলাই শ্রেয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয় ও অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিজয় অর্জনের সময় পর্যন্ত এই সরকারের কর্মকান্ডের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করা, দেশের অভ্যন্তর থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল ছাত্র জনতা ও যুবকদের যুব শিবিরে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাথে সাথে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করা এসবই ছিল প্রবাসী সরকারের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

মুজিবনগর সরকার গঠনের পটভূমি

বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাঙালি জাতিকে একটি যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ অনিবার্য-এই বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে পরিষ্কার ছিল। সেজন্য তিনি যেমন আপামর বাঙালিকে যুদ্ধে যাবার জন্য ব্যাকুল করে তুলেছিলেন, সে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও একটা বিকল্প নেতৃত্বও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মনে আস্থা জন্মেছিল যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই বিকল্প নেতৃত্ব যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হবে। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনার ফসল হচ্ছে মুজিবনগর সরকার। এই সরকার গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা পূর্ব পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায়।

২৬ মার্চ (১৯৭১) প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হলে ভারত সরকারের সাহায্যের বিষয় আলোচনা করার জন্য তাজউদ্দনি আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত যান এবং ১ এপ্রিল তারা 'ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় ভারতীয় গোয়েন্দা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দিল্লি পৌঁছেন। সেখানে অতি সহজেই ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সংগে তাদের সাক্ষাত হয়। পরে তাজউদ্দীন আহমদ সরকার গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু হন রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম নির্বাচিত করা হয়। তাজউদ্দীন এই সরকারের অপর তিন মন্ত্রী নির্বাচিত করেন যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। তাজউদ্দীন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালীন এক সংকটময় সময়ে এত সহজে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন যেন মনে হয় বঙ্গবন্ধু প্রবাসী সরকার গঠন না করে রাখলেও একটা দলীয় হাইকম্যান্ড গঠন করেছিলেন। এই হাইকম্যান্ডে ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান (বঙ্গবন্ধু নিজে), সাধারণ সম্পাদক (তাজউদ্দীন) এবং তিনজন সহ-সভাপতি (যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী)। তাজউদ্দীন আহমেদ এই হাইকম্যান্ডকেই প্রবাসী সরকারে পরিণত করেন। এই প্রবাসী সরকারকে ভারত গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার সবুজ সংকেত পাওয়া যায়। প্রবাসী সরকার গঠন এবং সেই সরকারকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনা ঘটে এপ্রিলের ৪ থেকে ৬ এর মধ্যে। এপ্রিলের ৮ অথবা ৯ তারিখে তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। দিল্লি ত্যাগের পূর্বেই তাজউদ্দীন আহমেদ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বেতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারের লক্ষ্যে একটা ভাষণ রেকর্ড করেন এবং বিএসএফের গোলক মজুমদারের নিকট ক্যাসেটটি হস্তান্তর করা হয়। দশ এপ্রিল রাত ৯:৩০ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিওর

শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে ভাষণটি প্রচারিত হয়। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের একটি অতিরিক্ত ট্রান্সমিটার এজন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ট্রান্সমিটারের নাম ঘোষণা করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। প্রকৃতপক্ষে এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি পরিষ্কার করেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমেদের দৃঢ়তার ফলে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়।

তাজউদ্দিন আহমেদ ১২ এপ্রিল মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	-	প্রেসিডেন্ট
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	-	ভাইস-প্রেসিডেন্ট
তাজউদ্দীন আহমেদ	-	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক আহমদ	-	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান	-	অভ্যন্তরীণ সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	-	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীন আহমেদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১৭ এপ্রিল (১৯৭১) নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। নতুন সরকার বৈদ্যনাথতলার নাম পাল্টে রাখেন মুজিবনগর। বাংলাদেশ সরকার কখনই মুজিবনগরে অবস্থান করেননি। কিন্তু 'মুজিবনগর' নামটি প্রতিকী তাৎপর্য বহন করতে থাকে। সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কোলকাতায়।

মুজিবনগর সরকারের বড় কৃতিত্ব 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র' দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বিশ্বে যে ক'টি দেশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে এ সম্বলিত ইংরেজিতে প্রণীত প্রক্লেমেশেন অব ইনডিপেনডেন্স বা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুজিবনগরে পাঠ করা হয় ১৭ এপ্রিল যা ২৩ শে মে ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই বাংলাদেশ গঠনের এবং পরবর্তীকালে সংবিধানের ভিত্তি। কারণ, এই ঘোষণার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ও রাষ্ট্রগঠন আইনত স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগরে সালাম গ্রহণ করছেন, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

স্বাধীনতা সনদের তাৎপর্য

ঘোষণাটি আইনের ভাষায় রচিত এবং তা রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম। নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার এবং চলমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে আইনগত ভিত্তি দেয়ার জন্য 'স্বাধীনতার সনদ' ঘোষণা করা হয়। এর মাধ্যমে মুজিবনগর প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধকরণ করা হয়। এই সনদে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন দেয়া হয়।

এই সনদটি যে জাতিসংঘ ঘোষিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় সংক্রান্ত সনদের আলোকে বৈধ ছিল তাও যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করা হয়। সনদে যুক্তি উপস্থাপন করে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র এলাকা এবং সম্মিলিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শাসন করার আইনগত অধিকার অর্জন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে প্রদেয় প্রতিশ্রুতি আদায় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা নিজেদের একত্রিত করার একটি আইনগত অধিকার অর্জন করেছে। এই অধিকার বলেই ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ বৈধতা পেয়েছে।

সনদে জাতিসংঘের সকল দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এবং এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রত্যাশা করা হয়।

আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ জারি

১০ এপ্রিল (১৯৭১) জারিকৃত এই আদেশটি ২৬ মার্চ (১৯৭১) থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান আমল থেকে চলমান সকল আইন (প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন সাপেক্ষে) বৈধকরণ ও কার্যকর করা। এ আদেশের বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন

মুজিবনগর সরকার একটি পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনাব রুহুল কুদ্দুস প্রধান সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জুলাই মাসে (১৯৭১) বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এগুলোর নাম দেয়া হয় জোনাল কাউন্সিল। মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষভোটে ১১ জন আঞ্চলিক চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে একজন করে আঞ্চলিক প্রশাসক বা জোনাল এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ত্রাণ, প্রকৌশল, পুলিশ, তথ্য ও হিসাব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশন গঠন

দেশ শত্রুমুক্ত করার পরপরই যেহেতু পুনর্গঠন একটি কাজ হবে এবং সে কাজে সরকারের পক্ষে কোনরূপ কালক্ষেপণ করা যাবে না, তাই স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং সদস্য ছিলেন (১) ড. খান সরওয়ার মুর্শেদ, (২) ড. মোশাররফ হোসেন, (৩) ড. এস. আর. বোস এবং (৪) ড. আনিসুজ্জামান।

মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটি গঠন

মুজিবনগর সরকারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই কমিটির নেতা। এর আহবায়ক ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন:

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (মস্কোপন্থী ন্যাপ এর প্রতিনিধি)
মনিসিংহ (কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি)
মনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস দলের নেতা)
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (আওয়ামী লীগ দলের প্রতিনিধি)
এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান (আওয়ামী লীগ দলের প্রতিনিধি)
খন্দকার মোশতাক আহমদ (মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি)

মুজিবনগর সরকারের বেতার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা

(ক) বেতার মাধ্যম

মুজিবনগর সরকার শুরু থেকেই প্রচার মাধ্যমকে গুরুত্ব প্রদান করেন। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হয় ২৬ মার্চ দুপুর ২ টায় কালুরঘাট কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে। ২৭ থেকে ৩০ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র চালু থাকে। ৩০ এপ্রিল এটি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বেতারকর্মীগণ ত্রিপুরা রাজ্যের বাগফা নামক স্থান থেকে ৩ এপ্রিল পুনরায় অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেন। ২৫ মে পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি চালু ছিল।

বিচ্ছিন্নভাবে ১০ এপ্রিল থেকে পরবর্তী কয়েকদিন শিলিগুড়ি থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র চালু রাখা হয় যে কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের প্রথম বেতার ভাষণ প্রচার করা হয়। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক ২৫ মে থেকে একটি বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়। এর নাম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' অক্ষুণ্ন রাখা হয়। বেতার কেন্দ্রটি ছিল কোলকাতায়। এই বেতার কেন্দ্র পরিচালনার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আব্দুল মান্নান এম.এন.এ-র উপর। ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি চালু ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী।

(খ) পত্রিকা প্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। গণমাধ্যম হিসেবে মূল্যবান অবদান রেখেছে এসব পত্র-পত্রিকা। সে সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক জয়বাংলা'। আব্দুল মান্নান এম.এন.এ. ছিলেন এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি এবং জিল্লুর রহমান এম.এন.এ. ছিলেন প্রধান সম্পাদক। ১১ মে থেকে ১৬ ডিসেম্বর এটি প্রকাশিত হয়। বহিঃবিশ্বে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকার Bangladesh নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। গেরিলা আক্রমণ ও সম্মুখ সমরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের তৎপরতার খবরের পাশাপাশি এই পত্রিকাগুলোতে থাকতো বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন ও আন্দোলনের খবর এবং বাঙালি কুটনীতিকদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণী।

পরিশিষ্ট
"স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামীলীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম,

এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া

এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহার প্রয়োগ ও পালন করিবেন। আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।'

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।
[*সংবিধান থেকে উদ্ধৃত*]

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• মুজিবনগর সরকারের অবদান পর্যালোচনা পূর্বক একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিন। • মুজিবনগর দিবস উদযাপন করুন। ঐ দিন একটি সেমিনার আয়োজন করে মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য আলোচনা করেন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিতি। ১০ এপ্রিল ঘোষিত মুজিবনগর সরকার ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ করে। বৈদ্যনাথতলার পরিবর্তিত নাম মুজিবনগর। ১০ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মুজিবনগর প্রশাসনের সকল কর্মকান্ডের বৈধকরণ করা হয়। যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের মৌলিক আইনের ভিত্তি ছিল এই স্বাধীনতার সনদ। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিল দেশের সংবিধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞানমূলক)
ক) মেহেরপুর খ) ফরিদপুর
গ) যশোর ঘ) খুলনা

২। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল কেন?
ক) দেশের অর্থ সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার জন্য খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য
গ) উজ্জীবিত বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ঘ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বহির্বিশ্বের সহায়তা লাভের চেষ্টার জন্য

৩। আনিসা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের জাদুঘরে গিয়ে দেখলো যে সেখানে খোদাই করে লেখা আছে "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম" উক্তিটি দেখে আনিসার কোন ঘটনা মনে পরেছে? (প্রয়োগ)
ক) গণঅভ্যুত্থান খ) ভাষা আন্দোলন
গ) ৭ মার্চের ভাষণ ঘ) শিক্ষা আন্দোলন

৪। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির আহবায়ক কে ছিলেন?
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) এইচ এম কামারুজ্জামান ঘ) তাজউদ্দীন আহ্মেদ

৫। সৈয়দ নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য–
i) তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা
ii) তিনি মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি
iii) তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ছকটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

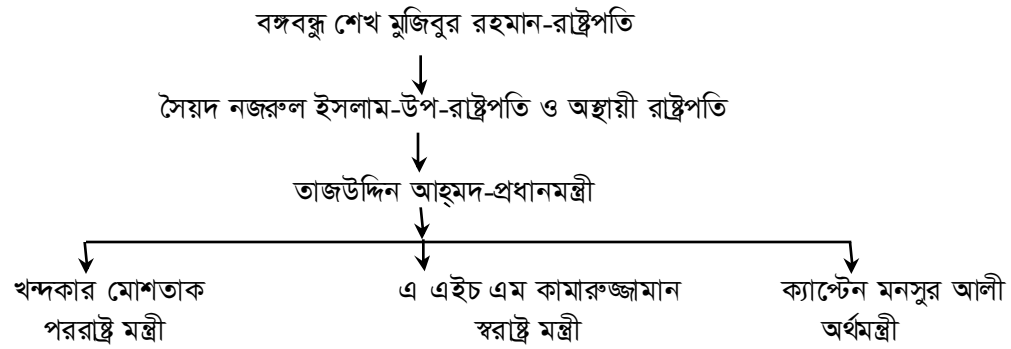

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় কবে?
খ. আগরতলা মামলা কী? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত সরকার কাঠামোটির সাথে পাঠ্য বইয়ের যে সরকার কাঠামো মিল দেখা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উক্ত সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সফল নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়েছিল– বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-১৪.৫ বেসামরিক ও সামরিক প্রতিরোধ এবং ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রতিরোধ সংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনী গঠনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক বিভিন্ন বাহিনী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	৭ মার্চের ঘোষণা, প্রতিরোধ যুদ্ধ, মুজিবনগর সরকারের দপ্তর বণ্টন, মুক্তিবাহিনী, গণবাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, মুজিব বাহিনী, যৌথবাহিনী, বঙ্গবন্ধু, নৌবহর।

২৬ মার্চ (১৯৭১) প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম.এ. হান্নানের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন। গোটা বাঙালি জাতির হৃদয়ে তখন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা: **'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'**। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট করেই জাতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সেদিন, আগাম একথাও বাঙালি জাতিকে জানিয়েছিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা (সবকিছু) বন্ধ করে দিবে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে গোটা বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ২৫ মার্চ (১৯৭১)দিবাগত রাতে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকা শহরের ঘুমন্ত নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর যে গণহত্যাযজ্ঞ ও সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে তখন তার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবেই সারা বাংলাদেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। পঁচিশে মার্চ রাতেই পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ইপিআর, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ। সামরিক জওয়ান ও আফিসারদের প্রতিরোধ যুদ্ধের পাশাপাশি দেশের প্রায় সকল নগর-বন্দর-শহরে, থানা ও জেলা সদরে, রেলওয়ে স্টেশনে, হাট-বাজারে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ২৬ মার্চ থেকেই প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধরত বাঙালি আফিসারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এম.এ.জি. ওসমানী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কে.এম. সফিউল্লাহ এবং কর্নেল এম. এ. রব। সেখানে চার সিনিয়র অফিসারকে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হয়: (১) মেজর কে. এম. সফিউল্লাহ-এর কমান্ডে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ময়মনসিংহ, (২) মেজর খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে কুমিল্লা ও সিলেট, (৩) মেজর জিয়াউর রহমানের কমান্ডে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং (৪) মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে কুষ্টিয়া অঞ্চলে।

মুজিবনগর সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনী গঠন

শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীকে মোকাবিলা করে পরাস্ত করার জন্য সুশৃঙ্খল সামরিক কাঠামোর অধীনে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রতি তাজউদ্দীন আহমেদ প্রথমেই নজর দেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ এপ্রিল বেতারে তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি সারা দেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেছিলেন। সেগুলো হলো:

১. মেজর খালেদ মোশাররফ - সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চল।
২. মেজর জিয়াউর রহমান - চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চল।
৩. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল।
৪. মেজর কে এম সফিউল্লাহ - ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল।
৫. মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ - রাজশাহী অঞ্চল।
৬. মেজর নাজমুল হক - সৈয়দপুর অঞ্চল।
৭. মেজর নওয়াজেশ - রংপুর অঞ্চল।
৮. মেজর জলিল - ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চল।

মুজিবনগর সরকারের দপ্তর বণ্টন হলে তাজউদ্দীন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রাখেন। ১৪ এপ্রিল কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক। মে ও জুন মাসে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। ফোর্সগুলির নাম ছিল: 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' এবং 'কে ফোর্স'। অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান, লেঃ কর্ণেল কে. এম সফিউল্লাহ ও লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ। ১১ থেকে ১৭ জুলাই কোলকাতায় ইতোপূর্বে গঠিত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাজউদ্দিন আহমেদ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাতেই বাংলাদশেকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এভাবে সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড স্থাপন করার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীকে মুজিবনগর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে।

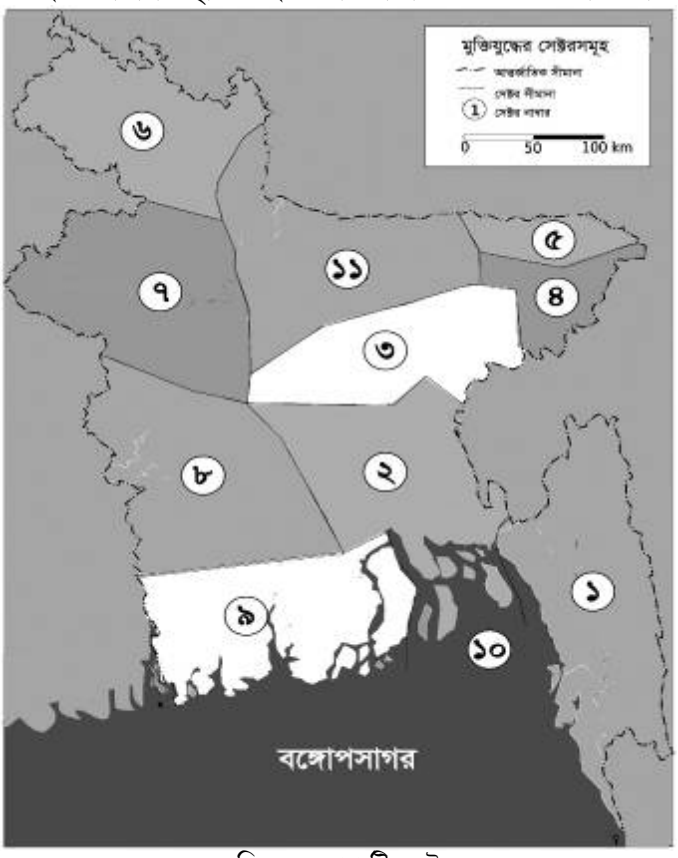

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামে অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপি.আর.-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও অনেকে গেরিলা বাহিনী গঠন করেন। যেমন টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনী, সিরাজগঞ্জে রফিক মির্জা বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, ঝিনাইদহের আকবর বাহিনী, বরিশালের কুদ্দুস বাহিনী, ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী প্রভৃতি।

ভারতের বাহিনীর মেজর জেনারেল ওবানের অধীনে বঙ্গবন্ধুর নামে 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি বাহিনী গঠিত হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর এ.কে. খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করা নৌসেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় প্রথম নৌবহর 'বঙ্গবন্ধু নৌবহর'। এছাড়া নৌকমান্ডোও গঠিত হয়।

ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও অস্ত্র দিয়ে সহায্য করে। তাছাড়া যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানী সেনাদের থেকেও অস্ত্র যোগাড় করা হয়।
বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী যার পরিসমাপ্তি ঘটে যৌথ বাহিনীর কমান্ডে বিজয় অভিযানে।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধ শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাযুদ্ধ শব্দ দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। মুক্তিযুদ্ধ বলতে বোঝায় বাঙালির সার্বিক মুক্তি। আর স্বাধীনতা যুদ্ধ কথাটির অর্থ হচ্ছে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ভৌগোলিক মুক্তি। অপরদিকে বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা, নিপীড়ন থেকে মুক্তি চাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি।

৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার গণহত্যা শুরু করলে তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। মুজিবনগর সরকার ১০ এপ্রিল সারাদেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেন। ১১ থেকে ১৭ জুলাই উক্ত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, আকবর বাহিনী, কুদ্দুস বাহিনী, আফসার বাহিনী প্রভৃতি। ভারতে আলাদাভাবে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
ক) ৮ টি খ) ৯ টি গ) ১০ টি ঘ) ১১ টি

২। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী কার নিকট প্রেরণ করা হয়?
ক) এম. এ রব খ) এম.এ জি ওসমানী গ) এম. এ হান্নান ঘ) তাজউদ্দিন আহমদ

৩। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা দল–
i) কুদ্দুস বাহিনী ii) হেমায়েত বাহিনী iii) কাদেরীয়া বাহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। মুক্তিযুদ্ধকালে আতাউল গনি ওসমানীর পদবি কী ছিল?
ক) মেজর খ) লে. কর্নেল গ) কর্নেল ঘ) মেজর জেনারেল

পাঠ-১৪.৬ জেনোসাইড বা গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ১৯৭১-এর শরণার্থী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও শরণার্থীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পাবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বধ্যভূমির সংখ্যা বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গণহত্যা, জেনোসাইড, বধ্যভূমি, গণকবর, নারী নির্যাতন,

ক. গণহত্যা

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ জেনোসাইড (Genocide)। গ্রিক জেনোস এবং লাতিন সাইড শব্দ দুটি মিলে জেনোসাইড শব্দের সৃষ্টি। জেনোস অর্থে বোঝায় জাতি। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গণহত্যার অর্থ কোন সরকার কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় জনগণকে নিঃশেষ করা। ১৯৪৫ সালে জেনোসাইড শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে গণহত্যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত যার কোন ক্ষমা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। মাত্র নয় মাসে এত বেশি মানুষ আর কোথাও হত্যা করা হয়নি।

পাকিস্তানী বাহিনী পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রিতে। বাঙালিকে শক্তির সাহায্যে দমন করার পরিকল্পনার নাম তারা দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট' বাঙালিদের দমন করার জন্য ৩ ব্যাটালিয়ন সৈন্য 'অপারেশন সার্চ লাইটে' অংশগ্রহণ করে। রাত ১১ টার দিকে অপারেশন শুরু হয়। এই অপারেশনের লক্ষ্য ছিল গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ। ঐ রাতে পুরো ঢাকা শহর আক্রান্ত হয়। সে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের হত্যা করে জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন জায়গায় গণকবর দেয়া হয়। সে রাতে ৭ জন শিক্ষক শহিদ হয়েছিলেন। শাঁখারি বাজার, তাঁতিবাজার, নয়াবাজার পুড়িয়ে দেয়া হয়। সে রাতে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকা শহরে দশ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছিল।

ভয়াল কালো রাত ২৫ মার্চ

২৫ মার্চ (১৯৭১) থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং তা চলে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই গণহত্যা চালানো হয়েছিল। যেখানে একসঙ্গে মৃতদেহ গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়েছে তাকে আমরা গণকবর বলি। আবার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে মানুষ ধরে নিয়ে যেয়ে হত্যা করে ফেলে রাখতো– সেগুলি বধ্যভূমি নামে অভিহিত। যেমন ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সংরক্ষণের অভাবে অনেক গণকবর ও বধ্যভূমি আজ বিলুপ্ত। এক জরিপে বাংলাদেশে এক হাজারেরও বেশি গণহত্যা ও বধ্যভূমির নাম পাওয়া গেছে।

গণহত্যা

খ. নারী নির্যাতন

মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নারী। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা ধর্ষিতা বা নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা আনুমানিক ছয় লাখের কাছাকাছি। মুক্তিযুদ্ধের পর নির্যাতিতা নারীদের সেবা প্রদানের জন্য এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তার জিওফ্রে ডেভিস। তাঁর মতে নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয়। তাঁর বর্ণনায় অন্তঃস্বত্তা মহিলার সংখ্যাই ছিল ২ লাখ। অন্তঃস্বত্তা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নারী নির্যাতন

গ. ১৯৭১-এর শরণার্থী

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শরণার্থী। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসরদের হত্যা, নিপীড়ন, ধর্ষণ এড়াতে ২৬ মার্চ থেকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী রাজ্যে যেতে থাকে। এরা শরণার্থী হিসেবে অভিহিত। বাংলাদেশের শতকরা ৯৪ ভাগ সীমান্ত ভারতের সাথে, বাকি ৬ ভাগ মিয়ানমারের সাথে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু বাসিন্দা সীমান্ত পেরিয়ে মিয়ানমারে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিয়ানমার যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সহানুভূতির সাথে দেখেনি, তাই মিয়ানমারের সীমান্ত অতিক্রম করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শরণার্থী সেদেশে বেশি যায়নি। বাংলাদেশের সংগে ভারতের পশ্চিমবাংলা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত ছিল। এসব রাজ্যের

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষজন শরণার্থীদের প্রতি সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল। উভয় অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল আছে। অনেকের আত্মীয় স্বজনও ছিলেন ওপারে।। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশেও অনেক শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

শরণার্থী স্রোত এপ্রিল থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতীয় হিসাব অনুযায়ী মোট ৯৮,৯৯,৩০৫ জন শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। শরণার্থী শিবিরের বাইরেও ছিলেন অনেক শরণার্থী। এই প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে স্বাভাবিক ভাবেই মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। কলেরা ও অন্যান্য রোগে মারা গেছেন অনেকে।

১৯৭১-এর শারণার্থী

ভারত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শরণার্থীদের সাহায্য দেওয়ার। শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন ভারত বর্ষের সাধারণ মানুষ, প্রবাসী বাঙালি, জাতিসংঘ ও বিশ্ববাসী। তবে সেসব দান ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

শরণার্থী সমস্যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমত: বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপ ভারতের পক্ষে দীর্ঘদিন সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ভারত সরকারকে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছিল শরণার্থীদের জন্য। এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল পাকিস্তানের পরাজয় ও মুক্তিযুদ্ধের জয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তান ভূখণ্ড থেকে শরণার্থীর স্রোত অনবরত ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে থাকায় পাকিস্তান এ কথা প্রমাণ করতে পারেনি যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে বিশ্বজনমত তার পক্ষে নেয়া সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত: শরণার্থী সমস্যাকে প্রধান করে ভারত বিশ্বজনমতকে তার পক্ষে ও বাংলাদেশের পক্ষে আনতে পেরেছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নিজের এলাকার যেকোন একটি গণহত্যা বা বধ্যভূমি সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ছয় লক্ষ নারী নির্যাতিত হন। সেসময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রতিবছরের মত এবারও ২৫ মার্চ রাতে তাসনিম তার বাবাকে কালো ব্যাজ পরতে দেখেছে। তিনি কোন হত্যাকান্ডের শোক প্রকাশের জন্য এই ব্যাজ পরছেন?

ক) ন্যাৎসি কর্তৃক ইহুদি নিধন
খ) অপারেশন সার্চ লাইট
গ) হিরোশিমা নাগাসাকি হত্যাকান্ড
ঘ) চুকনগর হত্যাকান্ড

২। ২৫ মার্চের গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি কী চেয়েছিল?

ক) গণহত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলার মাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে
খ) নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদদের হত্যা করতে
গ) অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বন্দি করতে
ঘ) ভীতিকর অবস্থা প্রদর্শন করে শাসন করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সাজ্জাদ জহির একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে এসে তিনি বলেন– এক রাতে পাকবাহিনী বাংলায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। সে হত্যাযজ্ঞ এখনো বিশ্বব্যাপী নিন্দিত। নির্বিচারে তারা মানুষ হত্যা করে। অনেক অনৈতিক কাজ করে। যা প্রথমে ঢাকা এবং পরবর্তিতে সারা দেশে পরিচালিত হয়।

৩। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রাত হলো–

ক) ৭ মার্চের রাত
খ) ১০ মার্চের রাত
গ) ২৪ মার্চের রাত
ঘ) ২৫ মার্চের রাত

৪। এ রাতে গণহত্যার কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)

i) বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাৎ করা ii) পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা iii) পাকিস্তানকে আলাদা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৫। এ রাতে গণহত্যার ফলে–

i) বাঙালির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়
ii) মানুষ ভীত হয়ে পালিয়ে যায়
iii) কঠোর প্রতিরোধ গড়তে প্রস্তুত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

১৯৯০ সালের ২ মার্চ ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রান্ত হয়। আকস্মিক আক্রমণে হতবিহবল কুয়েতি জনগণ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি দেশ সৌদিআরবে আশ্রয় নেয়। প্রতিবেশি দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান এর ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও জনগণ আশ্রয় প্রত্যাশী শরণার্থীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

ক. "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম" কে এই ঘোষণা দেন?

খ. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি পাকিস্তান আমলের যে ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে, পাঠ্য বইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উল্লিখিত মিত্র দেশটির সহযোগিতা ছিল আক্রান্ত দেশটির স্বাধীনতা লাভের অনুপ্রেরণা উৎস– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-১৪.৭ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক ও পেশাজীবী শ্রেণির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা ও ভারতের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে দালাল, রাজাকার, আলবদর-আলশামসদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বুদ্ধিজীবী, 'পূর্ববাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ', 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' তারামন বিবি, সিতারা বেগম, বামপন্থী দল, প্রবাসী বাঙালি, জর্জ হ্যারিসন, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, ইন্দিরা গান্ধী, পিস কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, বিহারী, টিক্কা খান, নারী নির্যাতন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের অতি দ্রুত জয়লাভের কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, নারী, শ্রমিক ও আপামর জনসাধারণের সমর্থন, প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ, ভারতের সমর্থন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

ক. ছাত্রদের ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৭৫% ছিল ছাত্র, যাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে– যেমন সেকশন কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল বেশি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ছাত্ররাই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সংগে মাত্র তিন সপ্তাহের সামরিক ট্রেনিংকে সম্বল করে তারা নিজ জীবনকে বাজি রেখে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে যারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কেউ শরণার্থী শিবিরে ও ইয়োথ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে। কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মুক্তি যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছে।

খ. বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করা, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, প্রচার মাধ্যমকে সচল রাখার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা, রেডিওতে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম প্রচার করা, প্রবাসী সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এসব কাজের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কেবল ১৯৭১ সালেই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তাতেও বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেসময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ব বাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' (৬.৩.১৯৭১), 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' (৬.৩.১৯৭১) ইত্যাদি সংগঠন। তাছাড়া শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, আইনজীবী সমিতি, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ও বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির ব্যানারে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণির সদস্যবৃন্দ রাস্তায় নেমে আসেন এবং বিভিন্ন মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অসংখ্য শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অসামরিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন: প্রবাসী শিক্ষকগণ ভারতীয় শিক্ষকবৃন্দের নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ২১ মে (১৯৭১) গঠন করেন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল কোলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'। ভারতের শিক্ষকগণের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শরণার্থী শিবিরে ৫৬ টি স্কুল চালু করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি 'বাংলাদেশ : দ্যা রিয়েলিটি', 'বাংলাদেশ : দ্যা ট্রুথ' প্রভৃতি নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সদস্যগণ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন।

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকার, চারু ও কারু শিল্পী প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইনটেলিজেন্টশিয়া'। এই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত গঠনের কাজ করে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। কেউ সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারীরূপে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার রান্না করে, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে, সেবাদান করে ইত্যাদি নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিটি নারী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন ও স্ত্রী-এর যেকোনো একটি। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো: কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা স্কোয়াড-এর আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর ট্রেনিং হয়। রণাঙ্গনের যোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। চিকিৎসার কাজে মহিলা চিকিৎসকগণের গৌরবময় দৃষ্টান্ত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম। তিনিও বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন। জনমতগঠনে দেশী-বিদেশী নারী মহিলা সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবংগ মহিলা সমিতি, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রশংসনীয় অবদান ছিল।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দলসমূহের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মস্কোপন্থী বামদলগুলো যেমন কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ), ন্যাপ (মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও কৃষক সমিতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চারদলের প্রায় ছয় হাজার সদস্য বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা পালন করে এবং স্পেশাল গেরিলা বাহিনীর ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল বাহিনীর একটি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরে আসার পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

চ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে (যেখানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন) বাঙালিরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন, স্মারকলিপি দেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লন্ডনে ইউরোপের অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিরা এসে মিলিত হতেন। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদেশের দূতাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : কোলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের হোসেন আলী এবং অন্যান্য বাঙালি স্টাফ (১৮.০৪.৭১), নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেলের

ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী (২৬.০৪.৭১), লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ (১.০৮.৭১), ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসে ইকনমিক কাউন্সিল পদে কর্মরত আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১.০৮.৭১), আবুল ফতেহ (ইরাকে কর্মরত ২১.০৮.৭১), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (দিল্লীতে কর্মরত, ৪.১০.৭১), আবদুল মোমিন (আর্জেন্টিনায় কর্মরত, ১১.১০.৭১), ওয়ালিউর রহমান (সুইজারল্যান্ডে কর্মরত, ০৩.১১.৭১) প্রমুখ।

অতএব বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ছ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও সেদেশের নাগরিকেরা বাঙালিদের সমর্থনে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা বাঙালিদের সংগে রাস্তায় নেমেছেন। পাকিস্তানে সিভিল সমাজের অনেকেই বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক কবি বাঙালি শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারের দানের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে অনশন করেছেন। বুয়েনস আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোর্হেস, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জর্জ হ্যারিসন, রিংগো স্টার, লিয়ন রাসেল, ওস্তাদ রবিশঙ্কর প্রমুখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। জন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গ বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছেন।

জ. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে ভারতের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দীর্ঘ নয় মাস ভারত প্রায় এককোটি শরণার্থীর ভরণ-পোষণের সকল খরচ বহন করে। মুক্তিবাহিনীর জন্ম ভারতের মাটিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদান, অস্ত্র সরবরাহ, রসদ প্রদান এসবই করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী। শেষ পর্যন্ত যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। ভারত শরণার্থী খাতে প্রায় ২৬০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও রসদ খাতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করে। তাছাড়া পাকিস্তানি বাহিনী ও যৌথ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে ভারতের প্রায় চার হাজার অফিসার ও জওয়ান শহীদ হয়েছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অবস্থান ছিল ভারতে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি কেবল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি, বিশ্ব জনমত গঠন করা, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায় করা ইত্যাদি কাজগুলোও তারা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস লিখতে হলে ভারতের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠি ও দল

লে. জেনারেল টিক্কা খান ৬ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও ৭ মার্চ গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ঐ দুই পদে বহাল থাকেন। ২ সেপ্টেম্বর ডা. এ.এম. মালিক গভর্নর এবং লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়। ডা. মালিকের নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর বাঙালিদের এক মন্ত্রিসভা

গঠন করার মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সকল বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক নয়। এসব বিশ্বাসঘাতক বাঙালিরাই মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সরকারের বাইরে থেকেই সৃষ্টি করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, সারাদেশে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও বিডি মেম্বারদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পিস কমিটি। এসব পিস কমিটির সদস্য এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ওপর চালিয়েছিল অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও তা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য কাজ।

পিস কমিটি বা শান্তি কমিটি

৯ এপ্রিল (১৯৭১) ঢাকায় ডানপন্থী বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করে। ১৪ এপ্রিল কমিটির নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। পরে জেলা, মহকুমা, থানা ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি কমিটি সাধারণ মানুষের কাছে পিস কমিটি নামে বেশি পরিচিত। পিস কমিটির সদস্যদেরকে দালাল বলা হয়। এখনও মানুষ রাজাকার ও দালালকে আলাদা নামে চেনে। রাজাকার বাহিনী গঠন, রাজাকারদেরকে পরিচালনা করা, রাজাকারের অপকর্মকে সম্মতি দেয়া এবং রাজাকারকে দিয়ে লূটপাট, অগ্নিসংযোগ করা, যুবতী মেয়েদেরকে ধরে আনা এসব কাজ দালালরাই করেছে।

রাজাকার বাহিনী

লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ৭১' জারি করেন। তার পূর্বেই '৭১-এর মে মাসে মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ ৯৬ জন জামায়াত কর্মীর সমন্বয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে 'রাজাকার বাহিনী' গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যান্সে এই নাম গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফ রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান রক্ষার সংগ্রামের চাইতে লুটপাট, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ এসব কাজে মগ্ন থেকেছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান দেওয়া, হানাদার বাহিনীকে তাদের বাড়িঘর চিনিয়ে দেওয়া, গ্রাম থেকে গরু-ছাগল-মুরগি ধরে এনে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে সরবরাহ করা, গ্রাম থেকে যুবতী নারী ধরে এনে আর্মি ক্যাম্পে সরবরাহ করা ইত্যাদি অপকর্মে রাজাকারদের নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

আলবদর বাহিনী

রাজাকার বাহিনী গঠনের পর আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তবে রাজাকারের অধ্যাদেশের মত এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উদ্যোগ ও প্রেরণায় এই বাহিনী গঠিত হয়। আলবদরদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে পাকিস্তান বাহিনী। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরাই আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই বাহিনীর কাজ ছিল দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ভাবধারার সমর্থক ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক শ্রেণিকে হত্যা করা।

আলশামস বাহিনী ও বিহারী সম্প্রদায়

আলশামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানত অবাঙালি (বিহারি)-দের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী বাহিনী এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এবং বাঙালি নিধনে দেয় অবাধ অধিকার। বাঙালির সম্পদ লুট করতেও এদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে বিহারী সম্প্রদায় যে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা অকল্পনীয়।

শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর বাহিনী প্রধানত গঠিত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মীয় পাকিস্তান পন্থী দলের কর্মী ও বিহারিদের দ্বারা। তবে, নৃশংস আলবদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রসংঘের সদস্যদের দ্বারা। এইসব হত্যাকান্ডে জামায়াতি ও মুসলিম লীগ নেতারা বিশেষ করে গোলাম আজম, ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রমুখ প্রধান ভূমিকা নেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ও দল সম্পর্কে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, পেশাজীবী শ্রেণি, শিল্পী, খেলোয়াড়, প্রবাসী বাঙালি প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও অবদান ছিল। অনেক বিদেশী নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তান সরকারকে ও বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে–

i) কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক ii) পুলিশ ইপিআর সেনাবাহিনী iii) আলবদর আল শামসবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে কতজন নারী সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহন করেন? (জ্ঞান)

ক) ২০০ জন খ) ৪০০ জন

গ) ৬০০ জন ঘ) ৮০০ জন

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন, শুধু এদেশের সর্বস্তরের জনগণই নয় অনেক দল ও সংগঠন এমনকি অনেক দেশ ও এ যুদ্ধে সহায়তা করেছে প্রতিবেশী একটি দেশ প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে সে সময় আশ্রয় দেয়। যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা তৈরির সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছিল।

৩। এদেশকে বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করেছিল– (অনুধাবন)

i) অধিকাংশ রাজনৈতিক দল

ii) পেশাজীবী সংগঠন

iii) সেনাবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন দেশের কথা বলা হয়েছে–

ক) চীন খ) নেপাল

গ) ভারত ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বুয়েনস আয়ার্সে মিছিল করেছেন–

i) বোহের্স ii) অ্যালেন গিনসবার্গ iii) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৮ মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পরাশক্তি, চিন, আমেরিকা, মুসলিম দেশ, ভারত, সেভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, শরণার্থী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। একভাগের নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ এবং ওআইসি বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার প্রতিবাদ করেনি বরং পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে।

সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশসমূহ সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বলয়ভুক্ত দেশসমূহ মার্কিনী সরকারের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়নি। তারা গণহত্যার নিন্দা করেছে, শরণার্থীদের সহায়তা করেছে, রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানিয়েছে।

চিন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। চীনের গণহত্যা সমর্থন বিশ্বজুড়ে এমনকি ভারত ও বাংলাদেশের চিনাপন্থী কমিউনিস্টদের বিপদে ফেলেছে।

জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে তিন পরাশক্তির বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যের নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে বাঙালির স্বাধীকার সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশের ঘটনায় ব্রিটেন সরকারিভাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষ নীতির কারণে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় ও বেতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা সহজতর হয়েছিল এবং ব্রিটেনের মাটিকে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার জন্য কোন সরকারি বাধা বিঘ্ন ছাড়াই জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এসব অবস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে। সে সময় মার্কিন সরকারের যুক্তি ছিল যে, পাকিস্তান পুরনো বন্ধু, সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য, সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ, তদুপরি মার্কিন-চিন সম্পর্ক উন্নয়নে পাকিস্তান তখন মধ্যস্থতা করছিল। কিন্তু তখন মার্কিন আইন পরিষদের সদস্যরা, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যম, জনসাধারণ অর্থাৎ এক কথায় সরকার ব্যতিরেকে আর সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে একটি অ্যাসাইমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে সবদেশের জনমত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। পরাশক্তিসমূহের বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। সে সময় যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল–

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) অবিভক্ত

২। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য কোন সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেয়?

ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) যুক্তরাজ্য

গ) সংযুক্ত আরব আমীরাত ঘ) চিন

পাঠ-১৪.৯ স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও বিজয়দিবস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো দেবার বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গেরিলা আক্রমন, ইন্দিরা গান্ধী, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী, ভারতীয় বাহিনী, যৌথবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, সপ্তম নৌবহর, জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জেনারেল নিয়াজী, কাদের সিদ্দিকী।

পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসর দালাল, আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন বাড়তে থাকে। ভারত ক্রমশ পাকিস্তানের সংগে সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেন। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে- স্পষ্ট করে বলা হয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী এক দেশ আক্রান্ত হলে অন্য দেশ তাকে সাহায্য করবে। নভেম্বরে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীকে স্পষ্ট করে নির্দেশ দেয়া হয় যে, সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর হামলায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি দেখা দিলে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে। এভাবে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক যৌথভাবে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনি পরিস্থিতিতে আসন্ন পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ১৮ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ভারতের বিমান বাহিনী। মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সর্বত্র পিছু হটতে শুরু করে। ৬ ডিসেম্বর ভূটান ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন তিনবার ভেটো দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর প্রেরণ করে। তার পাল্টা ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম নৌবহর ৭ম নৌবহরের পিছু নেয়। মিত্র বাহিনীও মার্কিন নৌবহরের চট্টগ্রাম অবতরণের সকল ব্যবস্থাই অচল করে দেয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে তৎকালীন রমনায় [বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] রেসকোর্সে পাকিস্তান বাহিনী ও এর সহযোগী শক্তিসমূহের আত্মসমর্পণ

শেষপর্যন্ত জেনারেল আবদুল্লাহ নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্সের যে স্থানে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসারসহ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জিওসি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর সংগে ঢাকায় আগত কাদের সিদ্দিকীও ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সূচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের 'আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়'।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলির বিবরণ লিখে শিক্ষককে দিন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথবাহিনী। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন তিনবার ভেটো দেয়। যৌথবাহিনীর হাতে পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বিজয় ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
ক) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ খ) পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ
গ) পাকিস্তানের নেপাল আক্রমণ ঘ) পাকিস্তানের ভুটান আক্রমণ

২। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে ভেটো দানকারি দেশ হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) ভারত খ) চীন
গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘ) ফ্রান্স

৩। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কত হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল?
ক) ৯০ হাজার খ) ৯১ হাজার
গ) ৯২ হাজার ঘ) ৯৩ হাজার

৪। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় দিবস কবে?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৭ এপ্রিল ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

পাঠ-১৪.১০ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সরকার গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুকে কী কী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জাতির জনক, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ, 'অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র আদেশ, ১৯৭২, যুদ্ধবন্দি, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, প্রশাসনিক কাঠামো, সীমান্ত চোরাচালান, দালাল, সংবিধান প্রণয়ন।

ভূমিকা: স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতির জনক। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে কেবল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রই উপহার দেননি, সেই রাষ্ট্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিও তিনি শক্তিশালী করেছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছর (১২-০১-১৯৭২ থেকে ১৪-০৮-১৯৭৫ পর্যন্ত) বাংলাদেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্পতম সময়ে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বাস্তবায়িত সংস্কার কর্মসূচিগুলো আলোচনা করলে আমরা এই মহান নেতার রাষ্ট্রনায়কোচিত নানান কৃতিত্বের কথা জানতে পারব।

সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কয়েকদিনের মধ্যেই মুজিবনগর প্রশাসনের সিনিয়র আমলাবৃন্দ (সচিব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে) ঢাকায় এসে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের সদস্যবৃন্দ ঢাকায় আসেন। ঢাকায় পৌঁছে তাজউদ্দীন আহমেদ তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর লন্ডন-দিল্লি হয়ে ১০-০১-৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক প্রবাসী সরকার গঠনের

সময়েই বঙ্গবন্ধু ঐ সরকারের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তাঁর অনুপস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু সেই পদে বহাল ছিলেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধু ১০.১.১৯৭২ তারিখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবেই নিজ মাতৃভূমিতে

বঙ্গবন্ধুর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন ১০ জানুয়ারি ১০৭২

প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকায় ফেরার পরদিন (১১.১.৭২ তারিখ রাতে) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের 'অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র আদেশ, ১৯৭২' জারি করেন। এই আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পরে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোটা বাংলাদেশ ছিল এক যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ড। মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস ও পিস কমিটির সদস্যরা সারা বাংলাদেশে ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ১৯ হাজার গ্রাম্য হাট-বাজার, ৩ হাজার অফিস-ভবন, ৬ হাজার হাই স্কুল, ১৮ হাজার প্রাইমারি স্কুল ও মাদরাসা এবং ৯০০ কলেজ ভবন পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ৩০০ রেল সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রায় ২০০ মাইল রেল লাইন সম্পূর্ণ বা আংশিক অকেজো করা হয়, শত শত বাস-ট্রাক ধ্বংস হয়, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দুটিতে মাইন পোতার ফলে অকার্যকর হয়ে পড়ে, দেশের বিমান বন্দরসমূহের রানওয়ের ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দেশের টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক লুটপাটের ফলে ব্যাংকগুলো হয়ে পড়ে তহবিল শূন্য। পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের পূর্বমুহূর্ত বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। তারা বিভিন্ন খাদ্য গুদামে মজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার ও কীটনাশক ধ্বংস করে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তান বাহিনী ও রাজাকার-আলবদর কর্তৃক লক্ষাধিক গরু জবাই করে মাংস খাওয়ার ফলে হালচাষের জন্য গবাদি পশুর

সংকট সৃষ্টি হয়। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে কৃষকগণ বসতবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে থাকার কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এমন সংকটময় অবস্থাতে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে ৯০ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী, ৩৭ হাজার রাজাকার ও দালাল ও প্রায় সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে সময় দক্ষ জনবলের অভাব (অর্থাৎ দক্ষ প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, ব্যাংকার, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীবর্গের অভাব) পূরণ করা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভেঙ্গে যাওয়া প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা বঙ্গবন্ধুর সরকারের জন্য ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধুর সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে আরও যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. একটি সংবিধান প্রণয়ন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা;

২. স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ করা;

৩. জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন করা;

৪. যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুর্নগঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান লাভ করা;

৫. মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও তাদেরকে পুনর্বাসন করা;

৬. শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে বাংলাদেশে পুনর্বাসন করা;

৭. দালালদের আটক করে বিচারের সম্মুখীন করা;

৮. পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা;

৯. বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রায় সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো;

১০. সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা;

১১. আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব মোকাবিলা করা;

১২. বাংলাদেশকে ঘিরে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা;

১৩. সরকার বিরোধী রাজনীতি (যেমন জাসদ ও সর্বহারা পার্টির সরকার বিরোধী কার্যকলাপ) মোকাবেলা করা;

১৪. ঐতিহাসিক এগার দফায় উল্লিখিত দাবিগুলো, যেমন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, ব্যাংক-বীমা, পাটকল ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের খাজনা কমানো, বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা;

১৫. শিল্প-কলকারখানা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সচল করে তোলা; এবং সর্বোপরি-

১৬. দেশের জনগণের আকশ্চুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	‘যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র’ শিরোনামে একটি অ্যাসাইনমেন্ট বা বাড়ির কাজ তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর লন্ডন-দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি ‘অন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র আদেশ ১৯৭২’ জারি করেন। ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েই পদত্যাগ করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দাযিত্ব গ্রহণ করার সময় বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন কবে?

ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ০৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল

গ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ) ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

২। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার কেন গ্রহণ করেন?

ক) বিধ্বস্ত দেশ পুর্নগঠনের জন্য খ) দুস্কৃতিকারীদের শাস্তি প্রদান করতে

গ) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য ঘ) স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

'ক' নামক শস্য শ্যামল একটি দেশের হাসান, লিন্ডা গোমেজ, শংকর ও সীমা বড়ুয়া তাদের নিজস্ব পার্বন ঈদ, বড় দিন, দোলযাত্রা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি স্বাধীন ভাবে পালন করে। এসব অনুষ্ঠান উদযাপনে রাষ্ট্রটি কোনরূপ সহায়তা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

৩। উদ্দীপকের শস্য-শ্যামল রাষ্ট্রটির সাথে বাংলাদেশের ১৯৭২ এর সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যটির সদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে?

ক) গণতন্ত্র খ) জাতীয়তাবাদ

গ) ধর্মনিরপেক্ষতা ঘ) সমাজতন্ত্র

৪। উক্ত বৈশিষ্ট্যটি দেশের জনগণকে দেয়–

ক) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খ) সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা

গ) সামাজিক স্বাধীনতা ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতা

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১ ঃ ১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২ ঃ ১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ ঃ ১. খ ২. গ ৩. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪ ঃ ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৫ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৬ ঃ ১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৭ ঃ ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৮ ঃ ১. ক ২. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৯ ঃ ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১০ঃ ১. গ ২. ক ৩. গ ৪. খ